ঘন্টা ঘাটের কথা

অক্ষয় কুমার আঢ্য

চুঁচুড়ার দক্ষিণে ঘন্টাঘাট । হুগলী কলেজ আর সার্কিট হাউসের মাঝামাঝি ঘাটখানি নেমে গেছে গঙ্গার বুকে। চুঁচুড়ার অন্যতম প্রাচীন ও পাকাপোক্ত ঘাট এটি । ঘাটের ওপরেই ছিল ওলন্দাজদের চ্যাপেল। চ্যাপেলের মাথায় ঘন্টাঘর। সেখানে ঝোলানো থাকতো একটি বিশাল ঘন্টা বা 'বিম্ ক্লক'। ঘন্টাঘাটের সেই গীর্জা ও বিম্ ক্লকের ছবি এঁকেছিলেন উইলিয়ম হজেস— ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে। প্রাচীন চুঁচুড়ার যে কটি ছবি পাওয়া যায় — এটি তার অন্যতম।

এই ঘন্টাটি থেকেই ঘাটের নাম ঘন্টাঘাট। ঘাটখানি অবশ্য তৈরী করিয়েছিলেন জনৈক নৃসিংহ দাস। স্থাপনের বছর টি হল ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ। শোনা যায়, নৃসিংহ দাসের আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে। বর্গীর হাঙ্গামার সময় তিনি চুঁচুড়ায় চলে আসেন এবং চুঁচুড়া চৌমাথার বেলতলার গলিতে একটি বড়বাড়ি ও ঠাকুরদালান নির্মাণ করেন । সেই ঠাকুর দালানে অদ্যাবধি শ্রীশ্রী ঁজগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বাঙলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামা চলেছিল ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে। অতএব— নৃসিংহ দাস তারও প্রায় সতেরো বছর পূর্বে চুঁচুড়ায় এসে এই ঘাটখানি নির্মাণ করলেন কেন? মনে রাখতে হবে ততদিনে ওলন্দাজরাও তাদের দুর্গ ফোর্ট গাসটাভাস নির্মাণ করে ফেলেছেন — তার্য প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে। অতএব তাঁরাই বা কেন তাদের কুঠীর সীমানা ঘেঁষে দাস মশায়কে ঘাট স্থাপনের অনুমতি দিলেন ? — তাহ'লে কি ধরে নিতে হবে যে বর্গীর হাঙ্গামার পূর্বেই নৃসিংহ দাসের চুঁচুড়াতে যাতায়াত ছিল এবং ওলন্দাজদের সঙ্গে তাঁর কোন ব্যবসায়িক লেনদেনও ছিল এবং নিজের প্রয়োজনেই তিনি ঘাটখানি নির্মাণ করেন? তবে, বর্গীর হাঙ্গামার কারণে চুঁচুড়া শহরের যে নব-জনবিন্যাস ঘটেছিল— সেটি অবশ্য ঐতিহাসিক সত্য। কেননা , এই শহরটির বর্তমানকালের অধিকাংশ প্রাচীন বংশেরই আদিপুষগণের আগমন ঘটে বর্গী উপদ্রব-পরবর্তী মধ্য অষ্টাদশ শতকে।

ঘন্টাঘাটের উত্তরদিকে ওলন্দাজেরা গড়ে তুললেন তাদের ভজনালয়। নৃসিংহ দাসের ঘাট নির্মাণের প্রায় বিশ বছর বাদে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) এই গীর্জাখানির নির্মাণ শু করেন ওলন্দাজ গভর্নর সিটারম্যান এবং এটিরনির্মাণ শেষ করেন পরবর্ত্তী গভর্নর মিঃ জি.ভার্নেট ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে। ফোর্ট গাসটাভাসের দক্ষিণ দিকের প্রবেশরথের পাশেই এই গীর্জা। (দুর্গের প্রবেশ পথের সাপেক্ষে নৃসিংহ দাসের ঘাটটির অবস্থান বিবেচনা করলে —ঘাটটির গুত্ব যথেষ্ট বেড়ে যায়।) সেই গীর্জাখানিরই শীর্ষে স্থাপন করা হয় ঘণ্টাটিকে। সেই থেকে ঘন্টার আওয়াজে লোকে নৃসিংহ দাসের নাম ভুলে গেল - ঘাটের নাম হল 'ঘন্টাঘাট '। গীর্জা নির্মানের প্রায় একশো বছর পরে ১৮৬৪ সালের আশ্বিনের ঝড়ে গীর্জার চূড়াটি ধূলিসাৎ হয়। সেই থেকে ঐ ঘণ্টাটিও নীরব হয়ে থাকে।

ওলন্দাজেরা গীর্জাখানি নির্মান করলেন বটে, তবে ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। জর্জ টয়নবী লিখেছেন - "But the Dutch appear to have been indifferent in matter's of religion. For many years after the Church was erected there was no clergyman; service was performed by a Ziekentroaster, or "of the sick," who was not in holy orders." ওলন্দাজ বালক- বালিকাগণের দীক্ষার প্রয়োজন হলে কলকাতা থেকে ধর্মযাজক আহ্বান করে আনা হত এবং তার জন্য ছিল নগদ বিদায়ের ব্যবস্থা। অবশ্য ড. দীপকরঞ্জন দাশ লিখেছেন - " ডাচ চার্চের প্রথম যাজক (প্লন্ডন্বদ্ধন্দ্বজ্ঞ) ছিলেন রেভারেণ্ড কিয়েব নানডের। তিনি ১৭৪৯ সালে মাসিক ৯৫.০০ টাকা বেতনে এই চার্চের চ্যাপলিন (প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট যাজক) নিযুক্ত হন।১৭৯৫ সালে

ইংরেজগণ কর্তৃক সাময়িকভাবে চুঁচুঁড়া অধিকার করা পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন (চুঁচুঁড়ার ডাচ চার্চ)।" তবে কিয়ের ন ানডের যখন ডাচ চার্চের প্রধান নিযুক্ত হন - সিটারম্যানের গীর্জা তো তখনও গড়েই ওঠেনি। এবং উক্ত ধর্মযাজক এই গীর্জা টির সর্বক্ষণের দায়িত্বে থাকলে , টয়েনবী বর্ণিত তথাকথিত কলকাতা থেকে যাজককে আহ্বান করে আনার প্রয়োজনই বা হয় কেন?- মনে হয়, কিয়ের নানডের এই গীর্জাটির সর্বক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন না- ওলন্দাজ উপনিবেশের অন্যান্য গীর্জ াগুলির তত্ত্বাবধানও তাকে করতে হত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য , চুঁচুঁড়ার সমাধিক্ষেত্রে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তা রিখে পরলোকগত জনৈক C.Kiernander এর সমাধি রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন সৈনিক (Captain - 15th Regiment N.I.) এবং মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতচল্লিশ বছর। তিনি পূর্বোক্ত যাজক কিয়ের লালডের-এর সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে যুক্ত ছিলেন কিনা বলতে পারি না।

১৮২৫ সালের ৭ই মে , চুঁচুঁড়া শহর বরাবরের মতো ইংরেজদের হস্তগত হলে , ওলন্দাজদের বিভিন্ন ধর্মীয় স ম্পত্তির সঙ্গে এই ভজনালয়ের দায়িত্বটিও এ্যাংলিকান চার্চের আঞ্চলিক প্রধান কলকাতার বিশপের উপর ন্যস্ত হয়। সেই থেকে এটি ছিল Indian Church Trustee-র অধীনে ধীনে। ক্রমশই এই গীর্জাটির প্রয়েজনীয়তা উক্ত ট্রস্টিগণের নিকট হ্র াস পেতে থাকে এবং ১৯৫০ সালের কিছু পূর্ব থেকে কর্তৃপক্ষ ঐ ভবনটি হুগলী মহসীন কলেজ কর্তৃপক্ষকে ব্যবহারের অনুমতি দেন। পরবর্তীকালে - ১৯৫০ সালের ৩রা আগস্ট তারিখে ০.৫৫৫ একর জমি সমন্বিত ঐ ভবন ও জমি কলেজ কর্তৃপক্ষ ক্রয় করে নেন। (Sale deed NO 2275, Calcutta Registration Office, executed by Indian Church Trustees in favour of Govt. of West Bengal on 3.8.1950).

আবার ফিরে আসি ঘণ্টাঘাটের কথায়। চুঁচুঁড়ার এক প্রাচীন ব্যক্তি শ্রী ঝিনাথ ভট্টাচার্য্যের মতে, ঘাটখানির দুপাশে দুটি জেটি ছিল। এই জেটি দুটির মধ্যে একখানির ছবি হজেসের ছবিতেও রয়েছে। ঘাটের বাঁ দিকের জেটিখানির ধবংস াবশেষ আজও কিছুটা দেখতে পাওয়া যায় - তবে দক্ষিণদিকের জেটিখানি পুরোপুরি ধবংস হয়ে কর্দমগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

হাওড়াথেকে রেলপথ প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে (১৮৫৪) হোরসিলার কোম্পানি কলকাতার জগন্নাথ ঘাট থেকে শ ান্তিপুর- কালনা পর্যন্ত প্রকাণ্ড দোতলা প্যাডল হুইল জাহাজ চালাতেন। সুতরাং চুঁচুঁড়ায় অবতরন করতে হলে যাত্রীবাহী জাহাজটিকে এই ঘণ্টাঘাটের জেটিতেই নামাতে হত - এটি ভাবা যেতে পারে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী আদালতের প্রসিদ্ধ" জাল প্রতাপচাঁদের মামলায় " সাক্ষ্য দিতে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন তাঁর নিজের জাহাজে চেপেই চুঁচুঁড়ায় আগমন করেন , সম্ভবতঃ তাঁকেও এই ঘাটটিতে পদার্পণ করতে হয়েছিল। সুতরাং জলপথে কলকাতা যেতে হলে চুঁচুঁড়াবাসীকে এই ঘাটখানিকেই ব্যবহার করতে হত - সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে জলপথে কলকাতা যাত্রা সে আমলে যথেষ্টই ব্যয়স াপেক্ষ ছিল- বিত্তবানরাই কেবল এই সুবিধা ভোগ করতে পারতেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

নৃসিংহ দাসের নির্মিত এই ঘাটখানি যখন কালক্রমে প্রায় ধবংস হয়ে যেতে বসেছিল, তখন তাঁরই বংশের এক মহিলা - শ্রীমতী কস্তুরমঞ্জরী দাসী ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে ঘাটখানির সংস্কার করেন। নৃসিংহ দাস এবং কস্তুরমঞ্জরীর স্মৃতিবাহী দুটি তুলসীমঞ্চ ঘণ্টাঘাটের দুই পাশে বিদ্যমান থেকে আজও তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে -

"শ্রী শ্রীঁ জগন্নাথ জীউ
শ্রীচরণ ভরসা।
স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতি
চির জাগক রাখিবার মানসে
এই "ঘণ্টাঘাটের " সমস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়া
ইহার উদ্‌থাপন (উদযাপন) করিলাম।
মা ভাগীরথী যেন অন্তিম শয়নে
অনাথিনীকে তাঁহার চিরশান্তিময়
অঙ্কে ধারণ করেন। ইতি -
তদীয় অভাগিনী সহধর্ম্মিনী কস্তুরমঞ্জরী দাসী

বৈশাখ, ১৩৪৩।”

ঘাটের দক্ষিণ দিকের নৃসিংহ দাসের স্মৃতিবাহী স্তম্ভে- স্মৃতিফলকখানির অতি জীর্ণ দশা; বর্ত্তমানে সেটির পাঠোদ্ধার করাই প্রায় দুঃসাধ্য। ফলকটিতে লেখা রয়েছে -

“সন১১৩২ সাল

১৯মাঘ

শ্রী নৃসিংহ দাস”।

ঘন্টাঘাটের কথা লিখতে বসে একজন ব্যক্তির কথা না উল্লেখ করলে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । ভদ্রলোকের নাম ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য— তবে লোকে তাঁকে চেনে ঝিনাথ ভট্টাচার্য্য নামে।

চুঁচুড়ার ঠাকুরগলির নিবাসী শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য একজন প্রবীণ নাগরিক। তিনি ঘন্টাঘাটের নিত্য স্নানার্থী— এই ঘাটেই তিনি ছেলেবেলায় সাঁতার কাটতে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্মৃতির সঙ্গে ঘন্টাঘাট সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। তাঁর কাছ থেকে শ্রী রাজীবকুমার ঘোষ এই ঘাটটি সম্পর্কিত এক অতিপ্রয়োজনীয় স্মৃতিচারণ সংগ্রহ করেছেন । সেই স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়— ঘন্টাঘাট সংলগ্ন গীর্জাখানি ছিল ওলন্দাজ গভর্নরের ছবি। তাদেরই সঙ্গে দু'জন পাদ্রীর ছবিও দেখেছিলেন ঝিনাথবাবু। কোথায় গেল সেই অমূল্য ছবিগুলি? আর ছিল গীর্জার সেই প্রসিদ্ধ ঘন্টাটি। আগুনের ঝড়ে গীর্জার চূড়া ভেঙে পড়ার পর থেকেই সেটি নিতান্ত অবহেলায় পড়ে ছিল গীর্জা সংলগ্ন উদ্যানে।

পূর্বেই বলা হ'য়েছে, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দেই গীর্জাখানি গীর্জা কর্তৃপক্ষ হস্তান্তর করেন। তার পূর্ব অবধি গীর্জায় একজন পাদ্রী ছিলেন— সেটি ঝিনাথবাবুর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়।

হুগলী মহসীন কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ গীর্জাভবনটিকে জীববিদ্যা চর্চার শ্রেণীকক্ষ রূপে ব্যবহার করে আসছিলেন। তারপর সহসাই বিগত শতাব্দীর শেষপাদে এই ঐতিহাসিক সৌধটিকে ধূলিসাৎ করে ফেলা হল। সেই অবিশ্বাস্য কীর্তিটির অন্তর্নিহিত কারণটি অদ্যাবধি স্থানীয় ইতিহাসপ্রেমীদের নিকট অজানাই রয়ে গেছে !

গীর্জা তো ধ্বংস হ'ল— প্রশ্ন হ'ল, কি ঘটল সেই বিমূক্কটির ভাগ্যে? — যে ঠিকাদার ভদ্রলোকটিকে সৌধখানি নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হ'য়েছিল— তিনি একটি ক্রেনের সাহায্যে ঘন্টাটিকে তুলে নিয়ে, তাঁর মানকুণ্ডুর নিবাসে নিয়ে যান। ঝিনাথবাবুর নিকট থেকেই জানা গেছে -- ঐ ঠিকাদার ভদ্রলোক তঁার মানকুণ্ডুর নতুন পাড়ার নিবাসে তঁার গৃহসংলগ্ন উদ্যানে একটি সুদৃশ্য বেদী নির্মাণ করে — তার উপর স্থাপন করেছেন ঘন্টাটিকে। ঝিনাথবাবু স্বয়ং চাক্ষুস করে এসেছেন সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞানটিকে।

আজ ঘন্টাঘাটের উত্তরপ্রান্তে পড়ে রয়েছে একখন্ড ফাঁকা জমি। সার্কিট হাউস কর্ত্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ সুরক্ষার কারণেই নুতন কোন অট্টালিকা নির্মাণের অনুমতি দেন নি। অবশ্য ভালই হ'য়েছে। সেই ঐতিহাসিক সৌধটির স্থানে একটি মর্মপীড়া উদ্রেককারী আধুনিক অট্টালিকা চুঁচুড়াপ্রেমীদের প্রীতি উৎপন্ন করত না ।

তবে ঘন্টাঘাট রয়েছে। হয়তো থাকবেও আরও কিছুকাল। তবে তার জন্য শহরের বর্তমান নাগরিকদের সচেতন হতে হবে— নতুবা তার কপালে অপেক্ষা করে রয়েছে গীর্জার পরিণতি ।

প্রসঙ্গসূত্র ঃ—

১। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ ঃ সুধীরকুমার মিত্র

২। কলিকাতা দর্পণ ঃ রাধারমণ মিত্র

৩। চুঁচুড়ার ডাচ চার্চ ঃ ড. দীপকরঞ্জন দাস

৪। Administration of Hooghly College : K. Zachariah

৫। Administration of the Hooghly District - George Toyanbee

৬। শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৭। শ্রী রাজীব কুমার ঘোষ

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com